১৯৭৭-১৯৭৯ সালে লেখা আমার বাংলা কবিতা থেকে এ-বইটির কবিতাগুলি নির্বাচন করেছেন শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়, বইটির নামও দিয়েছেন 'আশ্চর্য আপনি' কবিতাটির একটি লাইন থেকে। এ-বইটি প্রকাশের ব্যাপারে 'নাভানা'র শ্রী কুনাল রায়ের উৎসাহ বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

উৎসর্গ

করবী আর বরেনের জন্য

সূচীপত্র

যদি হাজার কিলোমিটার হাঁটতে হয়

যদি হাজার কিলোমিটার হাঁটতে হয়,
তাই হাঁটতে হবে।
অরণ্যের শেষে কুঠার আছে।

প্রিয় সহযাত্রীরা,
এই মন্থর রাত আমাদের মাতৃগর্ভ।
লক্ষ্য ক'রো,
প্রাথমিক অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

চতুর্দিকে স্পন্দন করছে শিরা-উপশিরা,
বুদ্‌বুদের মতো মৃদু শব্দগুলি অর্থবহ হয়ে উঠছে ;
ঐ সরসর করছে অস্পষ্ট চিত্রপত্রালী,
দ্রুত স'রে যাচ্ছে নিশাচরদের লঘু পদক্ষেপ।

ভরসা রাখো,
প্রকৃতির প্রাচীন নিয়মে আমরাও প্রস্তুত হবো,
দিনের বিস্ফারিত চোখে আমরাও চোখ রাখবো।

লাল ফুটবলের মতো যে অস্তসূর্যটাকে
লাফাতে লাফাতে তালবনে নেমে যেতে দেখেছি,
উলটো দিকের মাঠে দৌড়তে দৌড়তে
আবার বর্তুল তাকেই খপ্‌ ক'রে ধ'রে ফেলবো।

ওদিকে তোমরা কারা ?
আপত্তি আছে সহযাত্রী হতে ?

অজ্ঞাত বনপথের ভয়
বন্ধুসঙ্গে অবদমিত থাকবে না কি ?

যাদের জানুসন্ধিতে আড়ষ্টতা আসছে
তারাও জড়তা ঠেলে ফেলে চ'লে এসো,
নয়তো জোনাকি-জ্বলা জলাশয়ের পারে
ছেঁড়া জ্যোৎস্নায় ব্যর্থ ভর্ৎসনায়
ভৌতিক তোমাদের ফেলে রেখে আসতে হবে।

ফুটে উঠছে কি,
তোমাদের চেতনার নেগেটিভে,
রোদে ঝলসে-যাওয়া সেই কারুরেখ দেউল ?
মনে পড়ছে কি,
যে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,
দুপুরের আগেই সেই রুদ্র তেপান্তরে আমাদের পৌঁছতে হবে ?

যদি গোড়ালি ক্ষ'য়ে আসে,
তবে হামাগুড়ি দিয়েই এসো।
সুড়ঙ্গের শেষে সকাল আছে ॥

হয়তো সংরাগ চেয়েছিলাম

হয়তো সংরাগ চেয়েছিলাম,
হালখাতায় যার হিসাব নেই ;
দূরের প্রেক্ষিত মিলেছিলো
হ্রস্ব সন্ধ্যার রশ্মিতেই।

খোঁপায় কাঁটা-আঁটা একলা তাল
অথবা পলাশের পাকা আঙুল
স্থিতির বিকিরণে উদ্ভাসিত,
মনের দূরবীনে হাজার ভুল।

ধাবিত শত লোভ সোনালী স্তূপে,
ননীর বুদ্‌বুদে মন বিকল ;
অথচ নুন নেই জেনে গেলেই
নুনদানীর দিকে হাত উতল।

হয়তো সব চাওয়া স্যালাড-পাতা,
লেবুর রসে আর অলিভ তেলে
তাৎক্ষণিক দাঁতে কাটতে হয়,
তবেই স্বপ্নের স্বাদ মেলে।

দিনের কাকাতুয়া রাতে নীরব,
উচিত বক্তারও হারায় খেই ;
পথের নির্ণয় আঁকাবাঁকা
আলপথেই, সে আলপথেই।

কথায় হরীতকী কেনা-বেচার
অবসরেই সেই অভিজ্ঞান,
উড়ো বীজ, তৃণ, বন্য ঘ্রাণ,
কষায়মধুরতা পেয়েছিলাম ॥

আশ্চর্য আপনি

আশ্চর্য আপনি !
বলছেন তারের আলো ছিলো না,
আকাশ ছিলো একটা দানবীয় ক্যারমবোর্ড,
চাঁদটা স্ট্রাইকার,
আর তারাগুলো এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়া
জ্বলজ্বলে ঘুঁটি !

বলছেন বাটি-উলটানো দুধের মতো
জ্যোৎস্না আকাশময় গড়িয়ে পড়েছিলো,
আর জলের করিডর ধ'রে সাঁতরে যেতে যেতে
চাঁদের ঐ ভ্রান্তিজনক আলোয়

একটা রূপালী ইলিশকে দেখে ফেলেছিলেন !
জ্যোৎস্নায় চকচক করছিলো তার পিছল আঁশগুলো,
আর থেকে থেকে ঝাপট মারছিলো তেজী লেজটা :
সে-দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না !

বিশ্বাস করুন,
পাঁটি খবর দিচ্ছি,
সেজন্য উলটে আমাকে দোষী করবেন না :

যারা ক্যারম খেলছিলো তারা
সব ক'টা জ্বলন্ত ঘুঁটি কুড়িয়ে নিয়েছে,—
একটাও কাউকে বখশিশ দেয় নি ;

দৈব বিড়ালশিশুরা আপনার বাটি-উল্টানো দুধ
চেটে-পুটে খেয়ে নিয়েছে,—
এক চামচ বাকি রাখে নি ;

আর মাঝরাতের জলের সে খেলুড়ে মাছ
শেষরাতের জালে শিকার হয়েছে,—
জিততে পারে নি ॥

ভূগোলে পড়েছিলো

যদিও সে ভূগোলে পড়েছিলো
যে নদী স'রে যায়, বালি থাকে,
তবুও এ অঞ্চলে যে এত বালি
তা তার খেয়াল ছিলো না।

সে দেখলো যে দিগন্তে জলরেখা
ঝকঝক করছে ইস্পাতের টানটান
তারের মতো, আর পায়ের নিচে
অনুভব করলো গরম বালি।

জলের খোঁজে তখন তাকে
গরম বালির উপর দিয়ে হাঁটতে শিখতে হলো।

হাঁটতে হাঁটতে সে বুঝতে পারলো
কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী
অস্থি আর আভরণ, ভিত্তিগাত্র আর মিনার,
পাণ্ডুলিপি আর অনুশাসন চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে
ধুলোয় আর বালিতে পর্যবসিত হয়েছে।

সুসংবদ্ধ সমাজকেও সে চিনতে পারলো
হামানদিস্তায় সর্ষেদানার মতো,
প্রত্যাখ্যানে সংবেদনশীল হৃদয়ের মতো,
ক্রুশকাষ্ঠে ঈশ্বরপুত্রের মতো
ভঙ্গুর ব'লে ॥

মাননীয় মহাশয়দের উদ্দেশ্যে

প্রিয় মহাশয়,
আপনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে জানাই :
শুকনো চাল চর্বণ করবেন না,
উদরে যন্ত্রণা হবে।
আসুন, আমার টগবগে হাঁড়িতে
ফুটিয়ে নিন।

প্রিয় মহাশয়,
ভিক্ষুকের থলিতে
শুকনো চাল ঝাড়বেন না।
রন্ধন ক'রে
ব্যঞ্জন সহকারে
পরিবেশন করুন।

চাল দেবেন তো দিন,
কিন্তু শুধবেন প্রেমের ঋণ,
অপরকে সে-সামগ্রীই দেবেন
যে-দানে নিজে পুষ্ট হয়েছিলেন ॥

যখন আমরা চ'লে গেছি

যখন আমরা চ'লে গেছি তখন সজনে গাছের মাথায় অন্ধকার
ক'রে মেঘ জমবে। হাওয়া উঠবে, ডালগুলো দুলবে, ধুলো-পাতা
উড়বে। জলে খেতমাঠ থৈথৈ করবে, ছাগলছানাগুলো ডাক ছাড়বে,
খোড়ো চাল থেকে জল ঝরবে।

যে-খুঁটিনাটিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো সেগুলো লেপা-পোঁছা হয়ে
যাবে।
যে-বাস্তবটাকে রূপকথার আক্রমণ থেকে অনেক পরিশ্রম ক'রে
বাঁচানো গিয়েছিলো সেটা আবার রূপকথার শিকার হয়ে পড়বে।
প্রতিদিনের হাঁটা পথে যে-পল্লী নিতান্ত পরিচিত হয়ে
গিয়েছিলো গ্রহান্তরের গবাক্ষ থেকে তার কোনো অবয়বই দৃষ্টিগোচর
হবে না, মহাশূন্যে রূপালী ফুটকির অনুমেয় অংশমাত্র হয়ে জ্বলবে।

তবু আমাদের অনুরোধ, আমাদের জন্য কোঁচড়ের মুড়ি
আর দাওয়ার মাদুর রেখো। হয়তো একদিন এ পথেই আমাদের
ফিরে আসতে হবে॥

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে

*

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের মধ্যে
টুক ক'রে কখন ঢুকে পড়েছে
পাড়ার পাগলী।

বেলফুল, জড়োয়া আর বেনারসীর পাশে
নির্বিবাদে সীট নিয়ে নিয়েছে
নোংরা কানি।

বিড়বিড় করছে, কানি টানছে,
খেয়ালে
চেয়ার বদল করছে।

কেউ প্রায় লক্ষ্যই করছে না,
বা আড়চোখে তাকালেও
মুখে কিছু বলছে না,

কারণ এ পাড়ায় সে বিশেষ
পরিচিত।
কেউ তাকে ঘাঁটাতে

সাহস পায় না,
পাছে সে থান ইট বা
নোংরা ছুঁড়ে দেয়।

বন্ধুগণ, আর কত দিন আমরা
পাড়ার পাগলী হয়ে থাকবো
পড়শীদের সহিষ্ণু নীরবতার প্রশ্রয়ে?

নালন্দার পথে

আরোগ্যভবনের পাশ দিয়েই বিদ্যানিকেতনে যাবার পথ। যেটাকে পুরপরিখা ব'লে ভ্রম হতে পারে সেটা একটা দীর্ঘ ডোবা, কিংবা মন্থরগতি পয়ঃপ্রণালী। তার পূতিগন্ধ তীরে নগরীর শুভ্রবসনা শুশ্রূষাকারিণীরা পদচারণা করে। তাদের শিরস্ত্রাণ থেকে বিলম্বিত ত্রিকোণ পতাকার দরুন দূর থেকেও তাদের মূর্তিগুলিকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। পাশ দিয়ে স্থূলচক্র শকট চ'লে গেলে ধুলোর ঝড় এড়াবার জন্য তারা নাকে বস্ত্রখণ্ড চেপে ধরে। কখনও কখনও হাসাহাসি করতেও দেখা যায় তাদের।

বর্ষণের দিনে এই নারীরা ছত্রধারণ ক'রে থাকে। বন্ধুর পথের জলপূর্ণ গর্তগুলি এড়িয়ে এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে তাদের পাদুকারক্ষিত গোড়ালিগুলি এখানে ওখানে বিন্যস্ত ক'রে তখন তাদের চলাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সতর্কতা সত্ত্বেও তাদের আগুল্‌ফলম্বিত শ্বেতবস্ত্রের উপর কর্দমের চিহ্ন পড়ে। তাদের ছত্রপরিধি থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল ঝরতে থাকে। এক-একটা বৃত্তাকৃতি জলের ঝরোখার ভিতর দিয়ে রহস্যাক্রান্ত দেবীমূর্তির মতো তারা হেঁটে যায়। দেখলেই ছুটে গিয়ে কর্দমের উপর নতজানু হয়ে ব'সে বলতে ইচ্ছা করে, 'রক্ষা করো, কল্যাণী, দুঃসহ পীড়ার হাত থেকে রক্ষা করো আমাদের'। কিন্তু তারা কখনও বাক্যালাপ করে না পথিকদের সঙ্গে। শুধু নিষ্করুণ কটাক্ষপাত ক'রে নিষ্ক্রান্ত হয়।

আরোগ্যভবনের প্রাচীরের নিচে জনপদের নিঃস্বেরা বসবাস স্থাপন করেছে। তাদের সুবিধার্থে মার্গটিকে চওড়া করা হয়েছে এবং সম্মুখেই একটি প্রাচীন সায়র চালু রাখা হয়েছে। শীতের উজ্জ্বল সকালে তারা অবগাহন সেরে তাদের সর্বস্ব কেচে কেচে প্রাচীরগাত্রে মেলে দেয়। মার্গবিপণির যে রীতি এ দেশে প্রচলিত আছে তারই যেন প্রকারভেদ,

যদিও এ সামগ্রীগুলি আদৌ বিক্রয়ের জন্য নয়, নেহাতই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পৌষের হাওয়ায় সেসব লোল-তূলা তন্তুসার লেপতোষক, হৃতচিত্র কৃশ কাঁথা, আর নিতান্ত নগ্ন ছাতাকে আন্দোলিত হতে দেখলে আচম্বিতে মনে পড়ে হিমগিরির ঝিরিঝিরি বাতাসে ঈষৎ দোদুল্যমান রিক্তপত্র তুষারচূর্ণপ্রক্ষিপ্ত বৃক্ষশাখার কথা।

আরোগ্যভবন অতিক্রম ক'রে এলে একটি অন্ধ অস্থিসার মানুষ চোখে পড়ে। মাথার গুণ্ঠন থেকে বোঝা যায় যে সে নারী। একটি ছোট পুষ্করিণীর প্রান্তে ভিক্ষাপাত্র পাশে রেখে পরম ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ঠায় ব'সে থাকে। তার অক্ষিকোটরে দুটি শাদা বাদাম। সে দুটি কি প্রস্তরের মতো নিশ্চল, না কি ঘোলা জলের মতো ন'ড়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, তা ঠিক ঠাহর করতে পারি না। পারি না কারণ বেশিক্ষণ চোখ তুলে তাকাতে পারি না তাদের দিকে। অন্ত্রের অভ্যন্তরটা কীরকম ঘুলিয়ে ওঠে, আর গৌতমের গৃহত্যাগ স্মরণে আসে। যখনই এ পথে যাই, ভাবি, এখন বোধ হয় সে থাকবে না ; কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে দেখা গেছে। ওর কি আহার নেই, নিদ্রা নেই, বাক্যালাপ নেই, প্রাকৃতিক তাগিদ নেই ? হ্যাঁ, একদিন অবশ্য দেখেছিলাম, ঠিক জায়গাটিতে নেই, কয়েক হাত দূরে শুয়ে উসখুস করছে। ঐ ব'সে থাকাটাই ওর প্রিয়তম ভঙ্গি। আর যদিও ওর অক্ষিকোটরের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারি না, তবু এক দুর্মর কৌতূহল আমাকে প্ররোচিত করে ওর অন্বেষণে। পুষ্করিণীটি দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র আমার মনে এক অস্থিরতা জেগে ওঠে : সে কি আজ থাকবে, না থাকবে না ? যেমন দূরদূরান্তের জ্ঞানার্থীরা নালন্দার কেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তেমনই আমার অন্তঃসলিল চৈতন্যের সহস্র সংশয় ও জিজ্ঞাসা ঐ নির্বান্ধব মানবীর বিপন্ন অস্তিত্বের দিকে দুর্নিবার গতিতে ধাবিত হয়। গৌতম কী বুঝেছিলেন,
কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিছু আর স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি না : পরিচিত সূত্রের অর্থও হৃদয়ংগম হতে চায় না। শুধু বুঝতে পারি,

গৌতম সব-কিছু স্বচ্ছ ক'রে বুঝিয়ে যেতে পারেন নি,—
কিছু আবিল জলরাশি রয়ে গেছে।

বিদ্যানিকেতনে একদিন এ প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম, কিন্তু আলোচনায়
কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখালো না॥

হঠাৎ দুর্গাপুরের মধ্যেই

ধান ঝাড়া হচ্ছে।
যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই
দাড়ি-না-কামানো গালের মতো
ধান-কাটা খেত।
মাঝখানে একটা গোল জায়গায়
শক্ত মাটিতে
ধানের আঁটিগুলোকে
গাদা ক'রে রাখা হয়েছে।

এখানে আকাশের নিচে একটা
মুক্ত থিয়েটার—
আলের পর আল শূন্য খেতগুলিই
দর্শকদের গ্যালারি—
এখানে যত অ্যাক্শন :
একই ছন্দে একসঙ্গে নর্তকদের বাহুগুলো
উঠছে নামছে,
বাঁই বাঁই বাঁই ক'রে ধানের গোছাগুলো
তক্তার উপরে আছড়াচ্ছে,
ধানের বীজের
ছোট ছোট স্তূপ গ'ড়ে উঠছে,
সেগুলো বেড়ে বেড়ে
পাহাড় হচ্ছে।

কতগুলো আঁটি একটার উপর একটা সাজিয়ে
এক পাশে একটা কুটিরের মতো করা হয়েছে।

এটা সাজঘর,
ভিতরে লণ্ঠন, ছাড়া-লুঙ্গি, ইত্যাদি।

গোল রঙ্গমঞ্চে
ধান-ঝাড়ার গতিশীল অভিনয় চলছে,
মধ্যে মধ্যে বিড়ি-ব্রেক।

আলোয় ভরা বিকেলে
এই ধান্যবীজের ক্রমবর্ধমান
ঢিবিগুলির পাশে দাঁড়িয়ে
মনে হয় না যে কাছাকাছি অন্য কোনো
জীবনশৈলী থাকতে পারে।
নাগরিক বৃত্তি আমাদের রপ্ত হয় নি,
সুযোগ পেলেই নগরকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়
শাশ্বত শস্যক্ষেত্রের প্রসার।

শুধু অদূর দিগন্তে সৌধশিখর
আর দূর দিগন্তে কারখানার চোঙার অস্পষ্ট ধোঁয়া
ছবির পটভূমিকায় শিল্পীর তুলির
আলতো টানের মতো
ইস্পাতনগরীর পরিপ্রেক্ষিতকে
দ্বিধাগ্রস্তভাবে স্বীকৃতি জানায়॥

দুর্গাপুরে

দিগন্তজোড়া ধানখেতের উপর
ঢ'লে পড়েছিলো বিকেলের সুখী আলো।
নাম্পনিক আকাশের গম্বুজের নিচে
সেই আলোর ঢালাও ফরাসের উপর দাঁড়িয়ে
কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিলো যে
পৃথিবীর সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি করা হয়ে গেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁধানো রাস্তাটায়
দূর থেকে হনহন ক'রে হেঁটে আসছে একটি মানুষ
অন্য একটি মানুষকে ঠেলাগাড়িতে ঠেলে।

এ তো বিলেত নয়, যে কোনো বৃদ্ধ
অসুস্থ স্ত্রীকে হুইল-চেয়ারে ঠেলে আনবে।
তখনই আশঙ্কা ক'রে উঠেছিলো পঙ্কে জাত মন :
হয় নি,
হয় নি সব পাপের ক্ষালন।
কাছে এসেছিলো অচিরেই
নিথর দৃষ্টির দুই কুষ্ঠরোগী।

শাদা চাদরে গা ঢাকা ছিলো দু'জনারই,
যে বসেছিলো তার ছিলো না পায়ের পাতা,
যে গাড়িটা ঠেলছিলো তারও কতগুলো আঙুল ছিলো না।

দ্রুত পায়ে চরণহীনকে ঠেলে
মিলিয়ে গেছিলো শক্যতর মানুষটি
দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
অস্তরবির আড়ম্বরকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে॥

ছড়া

(পায়রার জন্য)

পায়রামতী পায়রামতী
দুর্গাপুরে ঘর,
বাহিরদ্বারে বনমহুয়া,
বর্ধমানে বর।

থাবার ঘরে পাখির বাসা,
জামায় দোলের ছাপ,
পায়ের নিচে শিয়ালকাঁটা,
কলতলাতে সাপ॥

এলিট সিনেমা থেকে বেরিয়ে

এলিট সিনেমা থেকে বেরিয়ে—
(রুশ সার্কাস : 'দ্য গ্রেট শো',
রুশ কার্টুন : ফুটবলখেলাবিষয়ক,
তা ছাড়া রকমারি বিদেশী ট্রেলার ও দেশী বিজ্ঞাপন)—
কাঁথায় শোওয়া একটি বিকলাঙ্গ মানুষ।
পাঁজরার উপর দুমড়ানো মুচড়ানো মাংস,
বুক পেট পিঠ একাকার,
মাথাটা ট্যাঁকে গোঁজা,
পাঁচ-পয়সা দশ-পয়সাগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো।

উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত জলের পাইপের মতো
কার্যকারণের সুড়ঙ্গপথে
যা কিছু সক্রিয় :
আদিম পাপ—
অত্যাচারী নিয়ন্তার অভিশাপ—
কৃতকর্মের বর্ধমান বটঝুরি,
কুচকাওয়াজ-করা ইতিহাসের
অচেতন বা সচেতন অক্ষৌহিণী,
ব্রাহ্মণ-হূণ-পাঠান-মোগল-
ফিরিঙ্গি-ফরাসের ঘৃণ্য চক্রান্ত :
যাবতীয় জঞ্জালই কি পুঞ্জীভূত,
না কি শুধু অগ্রপশ্চাৎরহিত
তাৎপর্যবর্জিত
অস্তিত্বমাত্র,
কালোদ্‌ভিন্ন ক্লিষ্ট কলেবর :

কেউ কি কথা দিয়ে কথা রাখে নি,
বা এই শাস্তিকেও কি
মেলানো হবে
দধিমঙ্গলে
শেষ সঙ্গমে :

অমীমাংসিত চতুরঙ্গ :
শুধু আপাতত
গণসার্কাস,
পথকার্টুন,
দ্য গ্রেটেস্ট্ শো অফ্ দেম্ অল্ ॥

ফিরিঙ্গি বণিকদের প্রেতাত্মাদের জবানবন্দি

(শ্রীমতী কাকলি রায়ের জন্য)

আত্মমগ্ন ভারতের তাঁতশিল্পকে আমরা যখন বিধ্বস্ত করেছিলাম
তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি
যে সে কীর্তির চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ায়
এত সত্বর
এ দেশের নন্দনপ্রিয় নাগরিকেরা
বসনের লোভনীয় লীলায় এমন প্রগাঢ়ভাবে প্রমত্ত হবে।

আমাদের কল্পনাতীত ছিলো
ডি-সি-এম-এর ঠাট,
গোয়ালিয়রের গৌরব,
মফত্‌লালের মাতব্বরি,
জিয়াজীর জয়জয়কার।

শালের মতো সম্মান এঁদের বেষ্টন করেছে,
সার্থক এঁদের শ্রেষ্ঠিজন্ম ;
আমাদের এই শ্লাঘনীয় উত্তরসূরিরা
সম্রাজ্ঞীর শিরোপার উপযুক্ত বটেন।

মেখলার মতো এঁদের প্রতিভা
ভারতের শ্রোণীকে আবদ্ধ করেছে,
যেমন একদা করেছিলো আমাদের পুরুষকার
দৈবের সনির্বন্ধ সহযোগিতায়।

বিপণির বিদ্যুতের ছটায়
বহুদর্শী চোখেও রীতিমতো ধাঁধাঁ লাগে,

শাড়ির ঝিকিমিকি মরীচিকায়
নাগরীরা কি দিগ্‌ভ্রান্ত নয় ?
ট্রাউজার ও নাকছাবির সমন্বয়
পুনরায় স্বীকৃতি পেয়েছে,—
(সেই স্ফুরিতনাসা দ্যুতিময় বেগমদের মনে পড়ে ?)—

পল্লীর প্রাঙ্গণেও অন্তঃপ্রবিষ্ট
নব্য বণিকদের প্রতাপ :
আলের উপর দিয়ে টলতে টলতে
বইয়ের ঝোলা কাঁধে যে-যুবকেরা ফিরছে
তারাও কুটিরে পাঠশালায় পৌঁছে দিচ্ছে
চিত্রিত রুবিয়া আর
চেক-কাটা স্যুটিং-এর স্মিত সংবাদ।

অবশ্য যারা আলের পাশে হাল চালাচ্ছে
তারা এখনও কেতাদুরস্ত হয় নি,
এবং নগরের মার্গেও গড়াগড়ি-দেওয়া
বস্ত্রবর্জিত খোকাখুকুর অভাব নেই।
যারা ভাতের চিন্তায় আত্মসমর্পিত
তাঁতের উৎসবে তারা অনাহূত :
ক্ষোভের বিষয়।

শিল্পধুরন্ধরদের প্রতি আমাদের উপদেশ :
এই বস্ত্রবঞ্চিত উঞ্ছজীবীদের
দরজির বৃত্তিতে দীক্ষিত করা হোক,
প্রস্তুত পোশাকে পূর্ণ অর্ণবপোতেরা
সমুদ্রে সমুদ্রে টংকার তুলুক,—
বিশ্বের বাজারে বাজিমাৎ হবে।

আমদানি, রপ্তানি, পরিবহণ, অবেক্ষণ,
পণ্যের গুণাগুণ ও শুল্ক নির্ধারণে
বিশেষজ্ঞগোষ্ঠীর অবশ্যই প্রয়োজন হবে ;
শুরু সেই কালোপযোগী ভূমিকায়
অভিজ্ঞ আমরা আবার অবতীর্ণ হবো ॥

অরূপরতন

অনেকখানি তপ্ত পথ হেঁটে আমরা সেই ছায়া-দোলানো
টিলাটায় পৌঁছলাম।

লম্বা গাছগুলোর খোলা চুলে তিরতির ঝিরঝির করছে বাতাস,
দিগন্তে ফিনিক দিচ্ছে রূপালী নদীর সরু ফিতে,
আমাদের জলের বোতল তখন শূন্য।

ভগবানের সঙ্গে ভাবসাব ক'রে
এখানে কয়েকজন ভক্ত খুঁটি গেড়েছে।
তকতক করছে তাদের আঙিনা,
সকালবিকাল ঝাঁট পড়ে।
খটরমটর মন্তর পড়তে পড়তে
জবা কানে এক শৈব মাতব্বর এলেন ;
পোশাক-আশাকের বালাই নেই,
যেন সেই ভরদুপুরের ভরাট ছায়াই
তাঁর নম্র অম্বর।

শৈবদের আড্ডার পাশেই বৈষ্ণবদের পরিপাটি আস্তানা।
সে ভারী ঘরোয়া,
ভারী শান্তিপূর্ণ,
রসসিক্ত সহাবস্থান।
শীর্ণ, হাসিমুখ, পান-রাঙা এক বোষ্টমীকে
জল ফোটাতে রাজী করতে কোনো বেগ পেতে হলো না।

নিকানো গর্তে এক রাশ শুকনো ডালপালা পুড়লো,
ছাউনি থেকে একটা ঢাকনাহীন প্রাচীন দোমড়ানো কেটলী বার হলো,
তাতে দূরের সেই নদীর জল গরম হতে থাকলো।

'হ্যাঁ, আমাগো কেটলী আছে,
চা নিংড়াইয়া রস খাই,
ভগবানের ছুত্তা কইয়্যা
ভাঁড় ধইর‍্যা গান গাই।
তোমরা দিদি কোন্ দেশের,
জলরে কেন ফুটাইয়া খাও?
পোলা আছে দেখতে পাই,
মাথায় কেন সিঁদুর নাই?'

প্রবাদ-অনুসারে
কেটলীর ধারে ব'সে গল্প করলে
জল সহজে ফোটে না;
তা ছাড়া এক কেটলী জল ফোটাতে
কত ডালপালাই না লাগে!
তবু, গল্প করতে করতে,
এক সময় জল ফুটলো।
এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট,—
ঘড়ি ধ'রে পাঁচ মিনিট ফোটালাম।

'এতক্ষণে জীবগুলার নাশ হইলো!
চক্ষে যাদের যায় না দেখন,
জলের দেহে বিলীন ছিলেন আত্মাগুলি,
ভবে যেমন অরূপরতন।
এমন নতুন গল্প, দিদি,
বোষ্টমীগো মননিধি,—
জলপাত্রে অগ্নিযোগে
পোকাগুলার ধ্রুব মরণ!
ভগবানের জয় গাই,

লয় পাইলো প্রেত-পোকা,
তাগো লাইগ্যা দুঃখু নাই।'

মনে আছে, পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছিলাম বোষ্টমীকে।
সে তো অবাক, তার হাসি থামতে চায় না :
এক কেটলী জল ফোটাবার জন্য একটা গোটা আধলা?
দিদির দিল দরাজ বটে!
সে আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে
যে দাম দেবার আদৌ কোনো দরকার নেই;
অবশ্য দিদি যদি দিতেই চান—
তাহলে ঠাকুর দিদিকে সুখে রাখুন,
গর্ভে আরও অরূপরতন পোলা আসুক।

তার পর, অনিবার্যত,
আরও পোলা হওয়া উচিত কি না সে প্রসঙ্গে
যুগোচিত কিছু আলোচনা চললো!
সাময়িক পরিপ্রেক্ষিত তার অজ্ঞাত নয়।

বেনারসীর মতো বর্ণিল বিকেলের গায়ে
যখন ছায়ার নক্‌শা, ছায়ার আঁচল জোড়া লাগে,
তখন সেই রসিক এবং যুগধর্মে অনুসন্ধিৎসু বোষ্টমীর
সহৃদয়তার কথা মনে পড়ে।
তার জলে ছিলো ধোঁয়ার গন্ধ, বালির কিচকিচে স্বাদ,
কিন্তু অগ্নিপূত সেই সত্তায় কীট ছিলো না,
নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছিলাম।

সন্ধ্যার হাঁড়ি চড়াবার আগে
যাদের ডালপালা কুড়োতে বেরোতে হয়,
তাদের জন্য এই শব্দগুলি উৎসর্গ করলাম।

মাঠে, ঝোপে-জঙ্গলে, টিলায়, বেড়ার ধারে
মৃত্তিকার সেই অন্নপরস্তনরা এখনও
জ্বালানী কাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছে
অস্তসূর্যের মতো রাঙা উনুনের আশায় ॥

অ্যান স্টিভেনসনের জন্য

Touching, talking,
exchanging our breath for wind . . .
lovers and friends, look back
at the land behind,

at all that remains
of the green delirious way;
the orderly rows of grey
and shades of grey

where you and you
and I, as in a cage,
stand motionless, formal—names
stained on a page,

—*Anne Stevenson*, 'THE GREY LAND'

A used country
wanting to be used.
Its history, a shell
broken, like this castle,
on the jaw of a hill
down which the cracked
chalk houses spill, an
avalanche arrested.
Hope lies at the bottom
in the valley of roofs.

Follow them, children,
cultivate the roofs as they
circle through their new and
grey necessary pastures.
Between highway and highway and
highway there may be a door.

—*Anne Stevenson*, 'TRAVELLING BEHIND GLASS'

রঙের পরিপ্রেক্ষিত রইলো না।

বৈরাগী পাতাগুলোর পত্‌পত্‌ করার মেয়াদও ফুরিয়ে গেলো।

গোলাপগুলো ম'রে গিয়েও অপ্রয়োজনীয় খ্রীষ্টের মতো
কাঁটাডালে আটকে থাকলো।
নিরুপায় গাছগুলো স্রেফ হাড়গোড় বার ক'রে
হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো,
যদিও তাদের গরিবি হটাতে প্রকৃতি এ মুহূর্তে প্রস্তুত নয়।

গ্রহটার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমতো,
ফাটা বলের মতো চুপসে যাচ্ছে, গ্যাসের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে
চারদিকে।
আকাশ, কুয়াশা, সমুদ্র, সৈকত, ধোঁয়া, বাড়িঘর,—
কিছু আর তফাৎ করা যাচ্ছে না।

শুধু থাকছে ট্র্যাফিকের চাপা গর্জনটা,— অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত,
যবনিকার অন্তরাল থেকে চেঁচিয়ে বলছে :
'আমরা আছি, আমরা আছি,
দু-পেয়েরা পিছিয়ে গেলেও
চার-চাকারা থেমে নেই,
কুহেলিকা ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছে।
হুঁশিয়ার, ভাইসকল !'

ধূপছায়া রঙের যদি নতুন মানে করা যেতো,
রঙবিলাসী বাঙালীদের শব্দের ছায়ায় বুঝিয়ে দেওয়া যেতো
ধূসর রঙ, গ্রে রঙ, অ্যান, তোমাকে কতখানি মানায় !

পরিত্যক্ত দমকলের ঘাঁটিতে সরকারী কৃষ্টিদপ্তরের
পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু শিল্পচর্চার আয়োজন :
কবিতার আসরের সভানেত্রী তুমি হয়ে থাকো।

সেরাত্রে সভায় ভিড়, ছাত্রছাত্রী, লম্বা চুল, দাড়ি,
কিছু রাজনীতির গন্ধ, কিছু বীয়রের,
দুজন আইরিশ কবি, একটি গীটার, আর কিছু বাড়াবাড়ি।

তাঁরা দুজনেই— একজন প্রটেস্ট্যান্ট, অপরজন ক্যাথলিক—
নিকটবর্তী পাবে মদ্যপান ক'রে এসেছিলেন।
যিনি ক্যাথলিক তিনি কিছুটা অতিরিক্ত করেছিলেন,
তা ছাড়া তাঁর বাঁ চোখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো
যে শুঁড়িখানায় কেউ তাঁকে ঘুঁষি মেরেছে,
অবশ্য সেটা কিছুদিন আগেকার ঘটনাও হতে পারে।

হাসি, কান্না, কৌতুকের টুংটাং নাড়ানাড়িতে—
যেন পেয়ালায় দুধ, চা, চিনি—
গীটারে গান জমেছিলো ভালোই,
হাততালিও পড়েছিলো প্রচুর,
গোলমাল বাধলো কবিতাপাঠে।
শব্দের গায়ে শব্দ,
ধ্বনির গায়ে ধ্বনি জড়িয়ে যেতে থাকলো,
হিকার ইটপাটকেলে ছন্দ হোঁচট খেতে লাগলো,
নিজেদেরই লেখা ভালো ভালো জীবন্ত লাইনকে
ওঁরা প্রকাশ্যে বেমালুম খুন ক'রে ফেললেন।

তোমার গ্রে রঙের ভেলভেটের গাউনটা প'রে
সভানেত্রীর চেয়ারে স্থির হয়ে তুমি দু' ঘণ্টা বসেছিলে,
কখনো মেঝের দিকে তাকিয়ে,
কখনো দেয়ালের দিকে।
কিশোরীদের কায়দায় ছাঁট দেওয়া তোমার চুলগুলি
কপালের উপর নরম ঝালরের মতো ঝুলছিলো।

নিমন্ত্রিত কবিদের কাণ্ডকারখানায়
যদিও তুমি মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছিলে
কারণ সে-সভায় উদ্যোক্তা ছিলে তুমিই,
তবুও তোমার মুখে যে শান্ত সহিষ্ণু হাসিটুকু
মেঘের গায়ে সন্ধ্যারশ্মির মতো লেগে থাকে
তা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষীণ হয় নি।
কদাচিৎ তোমার গ্রে ভেলভেটের গাউন থেকে
বিজলী আলোর স্পর্শে একটা স্তিমিত আভা বেরোচ্ছিলো।

চিত্রার্পিত পারাবতের মতো,
কবির ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো,
পাহাড়ের মিতাচারী প্রজ্ঞার মতো
তুমি নিঃশব্দে বসেছিলে।
আর কিছু নয়, যদি সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে
শুধু একটা মুক্তার হার গলায় লটকাতে,
তা-ও বড্ড বেশি হতো।

গ্রে তোমার রঙ,
তোমার স্মিতহাস্যের সহচর,
আবশ্যিক ধৈর্যের অভিজ্ঞান,
নিরুদ্দিষ্ট চিন্তার কাণ্ডারী।
সে দূর দিগন্তের অনিশ্চিত ফসল তোমারই।

চোখে, বা চশমার কাচে,
প্রোজেক্টরে,
দূরবীনে, বা অণুবীক্ষণে,
অ্যান, বলো কতক্ষণ ফোকস্ রাখতে পারা যায়?

আলপনা আঁকি, নক্‌শা কাটি, মিনে করি,
কাপড়ে সুতো বেঁধে বেঁধে রঙের বালতিতে চোবাই,
শূন্যের শালটার গায়ে জরির সহস্র ফুল তুলি,
তবু দুর্দম ধূসরতা
ধূপকাঠির অলস ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্ন করে।

যা কিছু স্পষ্ট হয় নি
তা স্পষ্ট হবার আর অবকাশ থাকে না।
যা কিছু স্পষ্ট হয়েছিলো
তাও দূরগামী নৌকার মতো ঝাপসা হয়ে আসে।
হিসাব থাকে না তাতে কী পণ্য বোঝাই করা হয়েছিলো—
ধান, না খড়, না কানাকড়ি।

বাচাল যৌবনের চা-পাতাগুলোকে
টি-পট্‌ উল্টে ফেলে দেওয়ার সময় এসে পড়ে।
অনেক রস নিংড়ানো হয়েছে।

যারা হোটেলে আমাদের পাশের টেবিলে ব'সে
খানাপিনা করছিলো
তাদের হট্টগোল থেমে যায়।
তারা কখন উঠে গেছে,
আলাপ হবার আগেই।

বিকেলের আলোয় যারা আমাদের আশে-পাশেই হাঁটছিলো
তারা পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।
বুড়িয়ে-যাওয়া ফসল-কাটা খেতের উপর
অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে দেখে
ছেলেরা চেঁচিয়ে ডাকে :

‘ও দাদুভাই, শুনছো,······’
তারা তখনো বোঝে নি
যে ঐ ভয়টুকুও আপতিক,
তাকে বাদ দেওয়া চলে ॥

মাসী আর বোনঝির কথাবার্তা

(পিয়ালীর জন্য)

মাসী, মাসী, তোমার চুলে ও কী ?
ভাঙা চিরুণী, মাথা ঘষেছি ।

মাসী, মাসী, তোমার চোখের নিচে ও কিসের দাগ ?
সময়ের কালি, সাবানে যায় না ।

মাসী, মাসী, তোমাদের আকাশে ওগুলো কী জিনিস ?
ন্যাড়া ডালপালার কুটিল তর্ক ।

মাসী, মাসী, তোমাদের গ্যারাজের গায়ে ওটা কী লতা ?
উত্তরের যুঁই, অগাস্টে ফোটে ।

মাসী, মাসী, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দূরে ওগুলো কী উড়ছে ?
বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, মেসোর শার্ট । হাতে কেচেছি ।

মাসী, মাসী, চারদিকে এত মরা পাতা, আধমরা আগাছা, বুড়ো
শ্যাওলা,
তাও সব-কিছু এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন ?

কারণ আজকে হঠাৎ, মধ্য-ডিসেম্বরে,
বেলা এগারোটায়, কুয়াশার লেপ ঠেলে
সূর্য উঠেছে ॥

কাফিলা

সঞ্জীবন, তিনটি মাত্রায়,
সৌরজগতের দৌলতে ;
অভিযান, দিগন্তের দিকে,
সারিবদ্ধ উটের মদতে ।

কদাচিৎ সংক্ষিপ্ত দোহদ
দাহময় বালুপ্রান্তরে ;
খিরা-খিরা, কচি হারা খিরা
বা খেজুর তৃষ্ণা দূর করে ।

নিরম্বু, নিরস্ত্র ভগ্নঘট ;
তবু ঔচিত্যে ছিদ্রময়,
সংকটের ওষ্ঠলগ্ন, মগ্ন
মুরলী মরুর বরাভয় ॥

বাঁশি

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শোনার সৌভাগ্য হয় নি।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি
রাখালের বাঁশি, সাপুড়ের বাঁশি, মেলার বাঁশি।

তার পর কত রকমের বাঁশি শুনলাম,
দুপুরে রেডিওর উদাস বাঁশি,
মাঝরাতে ভাঙা হৃদয়ের বাঁশি,
ক্যাসেট টেপে শান্তিনিকেতনী বাঁশি।

রেকর্ডে শুনেছি
ডালিমগাছের নিচে ইহুদী মেষপালকদের বাঁশি ;
ফাটা ডালিমের মতোই রসালো আর চঞ্চল তার সুর।
সে যে চ'লেই যাবে, তাকে ধ'রে রাখা যায় না।

বা পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে
অনিত্য কেল্‌টিক বাঁশি ;
শুনলেই ঘাগরা ঘুরিয়ে
এক দফা নেচে নিতে হবে
পাহাড়ের নিচে।

অবশেষে এই জ্যাজের বাঁশি.
জ্যাজের বাঁশি
আমাকে নিয়ে চলে দুই সৃষ্টির অন্তর্বর্তী
নাস্তির জলে,

সেই বিশাল কলকল অন্ধকারে
ঘোরায় অস্থির টর্চ।

বানের নদী।
আর কত দূর গোয়ালন্দ ?
মাঝি ভাই, বাঁশি বাজানো জানো না ॥

টেবিল-বদল

সেই সব দিন— অখণ্ড মুদ্রার পাপড়িগুলি,
অন্যদের তামাকের ধোঁয়ায় নিজেদের কফির আসর,
দক্ষিণী দানার মৌতাতে বাংলা কবিতার বাসর,
সম্ভাবনার সম্মান,
তুঙ্গ স্বপ্ন, সহজ স্লোগান।

এখনকার দিন— খঞ্জ পঙ্‌ক্তিদের সারিগুলি,
অন্যদের রক্তস্রোতে নিজেদের পণ্ডশ্রম,
বহুগোত্র জনতার ফাটা তাজিয়ার মহরম,
সমঝেও না সমঝার ভান,
স্বল্প অভিমান।

ঝোলানো-চুল সন্ধ্যা। সুরের গিঁঠের মতো পাকানো
সাধ্যাতীত সাধনার উদ্বোধন।
এখনও জন্মাচ্ছে অনেকের
সাধ, কুণ্ডলীকৃত দেহমন।

পিতৃগণ, মাতৃগণ,
সবই দেখেছিলেন,
জেনেছিলেন,
তবু চেপে গেছিলেন,
প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে
প্রলম্বিত ক'রে
সংগীতের প্রবঞ্চনা।

মন্দ না।
এখন আমরাও মঞ্চে চেপেছি।
এবারে আমাদের মুখোশ নাচের পালা।

ধৈর্য ধরুন,
প্রবেশে অধীর অভিনেতারা,
আপনাদেরও সুযোগ আসবে।
গড়ের মাঠ সবাইকার দাবিই রক্ষা করে।

বানের জল, কিছুক্ষণের জন্য
আমাদের মাচানে উঠো না।
নিষ্কৃতি দাও আমাদের অকালকুষ্মাণ্ডদের।
নত হও, ফণা।
ঐ শোনো, সেই বাঁশি বাজছে,
যা শুনে আমরাও এককালে
আবিষ্ট হয়েছিলাম॥

যখন ডাঙা ছিলো

যখন ডাঙা ছিলো,
তুমিও দুর্লভ ছিলে না,
ধুলো উড়িয়ে তোমার দেহলীতে পৌঁছে যেতাম।

তার পর একটা সময় এলো
যখন ডাঙা রয়েছে,
কিন্তু তোমার ঘর ফাঁকা।
তখন ধুলোই আমার পথ, পাথেয়, এবং পথের শেষ।

এখন ডাঙা নেই,
তুমিও ফেরার,
দিগন্তের নারকেলগাছগুলো পর্যন্ত শুধু বানের জল।

লগি ঠেলে ঠেলে
জল বেয়ে চলি
হাজার নৌকার হট্টগোলে,

যদি দৈবাৎ
তোমার তক্তার সঙ্গে
আমার তক্তার
ঠোকাঠুকি হয়ে যায়।

এখন শুধু একটা লাইনই খোলা আছে,
ছেদহীন জলের লাইন।

আলো নিভে আসে।
জল ওঠে পাটাতনে।

নিশানাস্বরূপ
গাছ আর কুটিরের ডুবু-ডুবু গোল মাথাগুলোর
হদিশ মেলে না।

রাত্রির নৌবিদ্যা জানা নেই,—
চতুর্দিকে সামাল সামাল রব।

ঘাট হয়ে ফিরে এসো॥

পাউডারের টিনে একটি মেয়ের মুখ

ছ'মাস যাবৎ একটি মেয়ের মুখ আমাকে বিব্রত করছে।

হাল্‌কা বেগ্‌নি রঙের একটা পাউডারের টিনের গায়ে
ডিম্বাকার একটা ছবির ভিতরে
একটি মেয়ের মুখ।

ছেচল্লিশ পেনিতে চারশোচল্লিশ গ্রাম পাউডার
সস্তা দেখেই,— পুরো এক বছর যাবে,—
অথচ ব্র্যাণ্ডটা ভালো, ঠকবার চান্স নেই,
সুপারমার্কেটের তাক থেকে তুলেছিলাম ;
অথবা সে চিত্রার্পিত অনাবৃত মুখটিই
নিয়ন্তা সে বেসাতির ;
এখন ছ'বেলা তাই ড্রেসিংটেবিলে
নিষ্পলক চাহনিতে চুম্বকীয় আকর্ষণে
ছ'মাস যাবৎ আমাকে বিব্রত করছে।

মুখের ছ'পাশে চুল, আস্কন্ধলম্বিত,
বাদামীতে সোনালীর পরিমিত তুলি-টান ;
কাঁধ ছুঁয়ে চুলের লেজগুলো নাগরার শুঁড়ের মতো উঁচিয়ে আছে ;
উচ্চাবচ কণ্ঠার নিচে লেসের ব্লাউজের নৌকাডৌল রেখা ;
রোগাই হবে মেয়েটি ;

রঙটা, রঙিন মুদ্রণের দৌলতে
ফ্যাকাশে নয়, বরং সমৃদ্ধ পিঙ্গল-তাম্র,
ভূমধ্যসাগরের সৈকতে সূর্যস্নান ক'রে এলে

শ্বেত নারীদের ত্বকে যে জলুসটা ঘনায়,
যেটা একাধারে রোশনাই আর মেঘমেদুরতা ;

ঠোঁটটা একটু ছড়ানো,
রানীর পরিবারের মেয়েদের মতো,
কিন্তু নাকটা পাতলা
আর ছায়াঘন বড় বড় চোখ দুটি
বাঙালী মেয়েরও হতে পারতো ।

ওর মাথায় একটা রোদ আটকাবার
ঢেউ খেলানো মস্ত শাদা টুপি,
তাতে একটা নীল বন্ধনী,
তার উপর দুটো ফুল,
হলুদ কেন্দ্রকে ঘিরে শাদা পাপড়ি ;
সে-ফুলটাকে কেউ ডাকেন মুন-ডেইজি ব'লে,
কেউ বলেন মার্গেরিট ;

মেয়েটির বাঁ ভুরুটা খানিকটা ঢাকা পড়েছে
টুপির ঢেউয়ের আড়ালে :
টুপিটাকে দেখাচ্ছে একটা ডানা-মেলা শাদা বক,
লঘু শরৎমেঘ
বা পাল-তোলা নৌকার মতো,
ছায়া ক'রে আছে
মেয়েটির কপালে, চোখের খোঁড়লে,
সামান্য টোল-খাওয়া গালে ।

দৃশ্যপটে অস্পষ্ট পত্রালি ;
ডিম্বাকার ফ্রেমের ভিতরে

শুধু ঐ মুখটির উপরেই
পড়েছে ক্যামেরার ফোকাস।

প্রতিযোগী রূপসী নয়,
চিত্রতারকা নয়,
পুঁথিপটে গুলবদনী বেগম নয়,
শাহানশাহের প্রাক্তন বা ইদানীন্তন
তিলোত্তমা প্রেমিকা নয় ;
সাধারণ ইংরেজ, বা স্কটিশ,
আইরিশ, বা ফরাসী মেয়ে,
ঘরের বোন বা পথের অপরিচিতার মতো
পরিচিত অথচ দুরূহ।

কিছুদিন যাবৎ বুঝতে পারছি
আমি মেয়েটির সঙ্গে একটা সাযুজ্য অনুভব করছি ;
আমি নিজেকে ওর উপরে অভিক্ষেপ করেছি ;
আমারই ছবির মতো, আয়নার বিম্বের মতো
ও সকাল-বিকাল আমার অভিমুখে প্রত্যুদ্‌গমন করছে,
তাই বিব্রত করছে।

শারীরিক অনুপুঙ্খে বড় একটা মিল নেই,
হয়তো সামান্য আছে,
নাকে, চোখে, অবিন্যস্ত চুলের দৈর্ঘ্যে,
কণ্ঠার বন্ধুরতায় ;
কিন্তু মুখের আদল ছাড়াও আরেক রকমের আদল হয়,
ভাবের, বা ভঙ্গির, বা ব্যঞ্জনার আদল ;
ও যা প্রকাশ করতে চাইছে
আর যা প্রকাশ করতে চাইছে না

তার দোটানার মধ্যে ধৃত
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যে মাইক্রো-সার্কিট,
সেখানেই ওর সঙ্গে আমার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
মিলে যাচ্ছে।

আসলে ট্যালকাম পাউডারের প্রয়োজনীয়তাটা
শীতের দেশের চেয়ে গ্রীষ্মের দেশেই বেশি।
ঐ মেয়েটি শীতল, ওর আঙ্গিক স্নিগ্ধ,
এখন দুপুরবেলা, ও এইমাত্র স্নান ক'রে এসেছে,
ওর আতপত্র টুপিটার ঢলের আড়ালে
বাঁ ভুরুটাকে ঈষৎ গোপন ক'রে
বাইরের পৃথিবীটাকে নিরীক্ষণ করছে।

দেখছে, অনেক কিছু দেখার আছে ;
ও ভীরু নয়, পলাতক নয়, ব্রীড়াবাষ্পাকুল নয়,—
তাহলে অনেক দেখাকেই বাদ দিতে হতো,—
যদিও সব কখনোই দেখা হবে না, তা সম্ভব নয় ;
ওর দৃষ্টিটা খোলা,
চোখের সামনে থেকে চিক বা মাকড়সার জালকে
সরিয়ে দিতে জানে ;
যতটা ছায়ায় থেকে রোদকে দেখা যায়
ততখানি ছায়াই ওর অবলম্বন ;

ওর অন্তস্থ উত্তাপ সংরক্ষিত,
এখনই খরচ করবে না,
তুষারঝড়ের দিন কাজে লাগতে পারে ;
দাহের দিনে ও মিতাচারী শীতলতার
আশ্রয় নিতে শিখেছে, নয়তো পুড়ে যাবার ভয় ;

ওর হাতটা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অবশ্যই
প্রয়োজন অনুসারে ও দস্তানা প'রে নেয়,
প্রেমিকের ঘরে পৌঁছলে খুলে পকেটে রাখে।

ওকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না,
সোনার হরিণে ওর বিশ্বাস নেই ;
ওর চোখ, ওর ঠোঁটের ডান কোণ
ভালো ক'রে খেয়াল করলে
বোঝা যায় যে ও যে-কোনো মুহূর্তে
হেসে দিতে পারে, কিন্তু স্থির ক'রে রেখেছে
আপাতত কৌতুকের ঊর্মিধর্মকে ;
মঞ্চের মুখর হাসি যে-কোনো অবসরেই
আর্তনাদ বা রোদন হয়ে যেতে পারে,
সে-পালাবদলের জন্য ও অনুক্ষণ প্রস্তুত ;

ও রায় দেয় নি, এখনও শুনছে
বিবাদী নক্ষত্রদের সাক্ষ্য ;
অতীত থেকে অধুনায়, অধুনা থেকে ভবিষ্যতে
তারে তারে তারায় তারায় জড়ানো জটিল
ওর সামনেকার বিশাল সুইচবোর্ডটা
সংজ্ঞায়, অনুজ্ঞায়, নির্দেশে, নিষেধে,
দ্যোতনায়, প্রত্যাহারে, দ্ব্যর্থাভাসে, অন্যোন্যবিরোধিতায়
অনবরত জ্বলছে নিভছে।
ওর মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করলেও
মুখ দেখে সে-টাটানি ঠাহর করা যাবে না।

ওর সব কথা,
শেষ কথা
বলা হয় নি, কখনও হবে না ॥

চুড়ি

॥ ১ ॥

সোনাঝুরি চুড়ি যার কৃশ হাতে
হায়দ্রাবাদী বালা তার হাতেই
মানিয়ে যায়, ঠিক মানিয়ে যায়।
কাচের আলো জ্বলে,
অবাক খোকা বলে :
'ছাখো তো, হীরা নাকি ? চোখ ধাঁধায়।'

হায়দ্রাবাদী ঠাট যার হাতে
হালকা জলচুড়ি তার হাতেই
মানিয়ে যায়, ঠিক মানিয়ে যায়।
ক'গাছি ক্ষীণ কাচ
পোকার পাখা-নাচ :
কারও বা চোখ, কারও মন টাটায়।

রঙিন জলচুড়ি যার হাতে
একলা শাদা শাঁখা তার হাতেই
মানিয়ে যায়, ঠিক মানিয়ে যায়।
অতীতের সুলক্ষণ
অধুনার হাল ফ্যাশন,
চটুল লোকালয়ে তালি কুড়ায়।

শাঁখার শাদা রেখা যার হাতে
রিক্ত কৃশ হাত সে-মেয়েকেই
মানিয়ে যায়, ঠিক মানিয়ে যায়।

যে-হাত কাজ জানে
সে-হাতই কাছে টানে,
কাজের পূর্ণতায় অর্থ পায়,
অথবা মিলনের সান্দ্রতায়।

॥ ২ ॥

অনেক দিন আগের কথা—
উত্তরবাংলার গ্রামাঞ্চলে
আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়,
আমার মা আমাকে একজোড়া
সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছিলেন।
সেকালে ঐরকম রেয়াজ ছিলো।
গ্রামীণ স্বর্ণকাররা খদ্দেরদের বাড়িতে এসে
বারান্দায় ব'সে হাপর জ্বালিয়ে
অর্ডারমাফিক খুচরো গয়না
তৈরি ক'রে দিতেন।
ছোটরা ঐ ওয়র্কশপ্‌কে ঘিরে ব'সে থেকে
আনন্দ উদ্ধার করতো।

সে-সময়ে আমাদের বাড়িতে বিজ্ঞানবিষয়ক
ছেঁড়াখোঁড়া এমন একটা বাংলা বই ছিলো
যা থেকে টুকরোটাকরা বস্তুবিষয়ক
জ্ঞান আহরণ করতাম।

একদিন পড়লাম যে পারার ছোঁয়া লাগলে
সোনা কালো হয়ে কেটে যায়।

আমি জানতাম যে থার্মমিটারের ভিতরকার
ছোট ছোট গুলিগুলোর নামই পারা।

আমাদের বাড়িতে একটা ভাঙা থার্মমিটার ছিলো।
এক গভীর দুপুরে,
সবাই যখন ঘুমিয়ে,
আমি ভাঙা থার্মমিটারটা থেকে
কতগুলো গুলি বার ক'রে
আমার বাঁ-হাতের চুড়িটার উপর
চেপে ধ'রে ব'সে রইলাম।
আমার জীবনের প্রথম বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট।

তৎক্ষণাৎ কিছু হলো না।
নিরাশ হয়ে গুলিগুলো সরিয়ে রাখলাম।

বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে যখন খেলছি
তখনও চুড়িটার কোনো রূপান্তর হয় নি।
আমি মনে মনে বলেছিলাম,
ধুৎ, বইটাতে বাজে কথা লিখেছে,
পারা লাগলে সোনার কিছু হয় না।

সন্ধ্যা নামতে ঘরে ফেরার সময় হলো।
সভয়ে লক্ষ্য করলাম
আমার বাঁ-হাতের চুড়িটা
কালো হয়ে কেটে গেছে।
সেই থেকে বিজ্ঞানে বিশ্বাস।

আমার মা আমার হাত থেকে
চুড়িদুটো সেই যে খুলে নিলেন,

আর সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিলেন না,
আমার জন্য না,
আমার ছোট বোনেদের জন্যও না,
আমাদের বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত।

আসলে আমার মা আধুনিক রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন,
ছোট মেয়েদের হাতে সোনার শিকল পছন্দ করতেন না।
প্রথমা কন্যার ক্ষেত্রে
প্রচলিত প্রথার সঙ্গে
আপস করেছিলেন ;
প্রথম সুযোগেই
ভুল সংশোধন ক'রে নিলেন।

প্রবীণা আত্মীয়ারা আমাদের খালি হাত লক্ষ্য ক'রে
আমাদের মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতেন।
মা শুনিয়ে দিতেন যে তাঁর কন্যারা
লক্ষ্মীর বদলে সরস্বতীর সেবাতেই সমর্পিত।
তা ছাড়া আমাদের শুচিবায়ুসঞ্চারিত
মিশনারি স্কুলে
গহনার হিঁদুয়ানিকে উৎসাহ দেওয়া হতো না।

পরে কলেজে ঢুকে
খেয়ালখুশিমতো কাচের চুড়ি
আর রুপোর বালা পরার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।
মেলায় কেনা একটা টিনের বাক্সে
সে-সব সরঞ্জাম জমিয়ে রাখতাম।
কালক্রমে সেই সংগ্রহে
বিচিত্র উপাদান সংযোজিত হয়েছে :

উড়িষ্যার ঝিনুকের মালা,
বিবি ফতিমার অভয়হাত-দেখানো লকেট,
মার্কিন বন্ধুর দেওয়া কাস্তে-হাতুড়ি-মার্কা রুশ ব্রোচ,
পাতানো রুশ দাদুর দেওয়া মার্কিন রৌপ্যডলার,
ইত্যাদি।

কিন্তু ছোটবেলার সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে
অষ্টপ্রহর চুড়ি প'রে থাকার অভ্যাসটা
কিছুতেই আর রপ্ত হলো না
কোনো বোনেরই।

জল লাগাই না ব'লে
বিয়ের পনেরো বছর পর
আমার চুড়ির পালিশ তেমনই আছে।
সত্যি বলতে কী,
চুড়ি প'রে ঘরের কাজ করা যায় না,—
বাধা লাগে,
তা ছাড়া লিখতে
বা টাইপ করতে
বড্ড অসুবিধা হয়।
গাছা-গাছা চুড়ি
তাঁরাই সর্বক্ষণ প'রে থাকতে পারেন
যাঁদের খাটতে হয় না।
অন্য স্বত্বাধিকার থেকে প্রবঞ্চিত যাঁরা
অলংকার তাঁদেরই স্ত্রীধন।

চুড়ির বিরুদ্ধে নই আমি।
বিকেলের আলো যখন রঙিন শাড়িকে

অতিরিক্ত গৌরব দেয়,
তখনকার দেওয়া-নেওয়ায়
চুড়ি পরতে ভালোই লাগে,—
একটা হালকা সংক্ষিপ্ত আনন্দ
যা ধারণ করা যায়,
আবার সহজে খুলে রাখাও যায়।

মনে পড়ছে আমাদের কলেজজীবনে
জলচুড়ি প'রে ব্যাডমিণ্টন খেলাটা
হঠাৎ কেতাত্বরস্ত হয়ে উঠেছিলো।
র‍্যাকেটের ঘায়ে চুড়ি ভেঙে যেতো,
কদাচিৎ কারও হাত থেকে রক্ত ফুটতে দেখেছি।
একডজন জলচুড়ি প'রে রতিক্রিয়ায় মগ্ন হলে
কতগুলো চুড়ি ভাঙবে,
কতগুলো রেহাই পাবে,
সে কাল্পনিক সমস্যা নিয়ে
হাসিঠাট্টা শুনেছি
সংস্কৃত কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে।

এখন বুঝতে পারি সেই দুরন্তপনার অর্থ,
আমাদের অধৈর্য কৌমার্যের ভাঙনবিলাসের তাৎপর্য,
যে-অস্থৈর্যকে বর্ষণস্ফীত খরস্রোতের বাঁকে
কংক্রীটের বাঁধে আটকে রাখা হয়েছিলো।
বাঁধে সব বন্যা আটকায় না।

আমার ভালো লাগে সেই মেয়েদের হাত,
কর্মে যাদের পরিচয়,
বলয়সংঘট্টে নয়,

আভরণকে যারা প্রত্যাখ্যান করে নি,
কিন্তু তার ধারণ আর মোচনের
লগ্নকে চিনেছে।

গরবিনীদের কঙ্কণনিক্বণের চেয়ে
মেহনতী মেয়েদের স্বর্ণরিক্ত রোগা হাত
আমার প্রিয়তর,
যদিও শেষোক্তরাও সামাজিক ছলনায়
সোনা না জোটে তো কাচ বা গালার ঘায়ে
মশলা পেষে, বাসনে ছাই ঘষে, কাপড় আছড়ায়।

যেহেতু চুড়ির ঝিলিক আর ঝংকার যে-দেশের প্রিয়,
সে-দেশেই সোনার চুড়ির জন্য বালিকারা খুন হয়েছে,
এবং বিধবাদের হাত থেকে চুড়ি খুলে নেওয়া হয়েছে,
সেহেতু ঐ বাঁধনের প্রতি আসক্তির বাড়াবাড়ি
শোভা পায় না আমাদের।

চুড়ি শুধু টোপ,
মাছ নয়।
পুরুষ, তুমি কী চাও,
চুড়ি, না শাড়ি, না মেয়ে?
কাকে নিয়ে স্বপ্ন তোমার,
তোমার শয্যা?

সে যদি খালি হাতে আসতে চায়,
খালি হাতেই আসতে দাও তাকে॥

সত্যনারায়ণের পাঁচালি

'সত্য কোথায়, বলতে পারো?'
শুধিয়েছিলে।
সত্য কথা বলার সাহস
তুমিই দিলে।

তোমার, আমার, তাদের সত্য
পৃথক পৃথক,
প্রাতিভাসিক পাখনা মেলা
উড্ডীন বক।

একশো পাখির ডানার ঝাপট
এক হয়ে যায়।
বিকচ মুদ্রা ভ্রান্তি আনে
হাজার তারায়।

সপ্তপদীর সত্য আমার
হয় নি জানা।
আগুন নিয়ে সীতার খেলা
আমার মানা।

মৃৎপ্রতিমায় মুমূর্ষু চোখ
বসিয়ে রাখি।
সপ্ত প্রহর উপোস করায়
দিই নি ফাঁকি।

আমার সত্য যোজন যোজন
উত্তরণে,

অবাক-করা হঠাৎ-দেওয়ার
বিস্ফোরণে।

আমার সত্য আমার গানের
একতারাতে,
রান্নাঘরের ঠাণ্ডা দিনের
গরম ভাতে।

আমার সত্য পার্স্‌লি-পাতায়,
লিলির ঝাড়ে;
ভ্রূণের মতো নির্ভাবনায়
রক্ত কাড়ে।

সত্য লুকায় চোখের কোনায়,
ঠোঁটের ধারে,
আলোর সঙ্গে জোয়াল-বাঁধা
অন্ধকারে।

দিনের ভুলের, রাতের মিলের
অশ্রুজলে,
কথার খিলে দোর এঁটেছি,
বন্দী হলে॥